রবীন্দ্র-অভ্যুদয়ের প্রাক্কালে বাংলার সংগীত

বাংলায় যখন সংগীতের নব্যচেতনা জাগ্রত হয়েছিল তখনো বঙ্কিম-প্রবর্তিত সাহিত্যচেতনা জাগ্রত হয় নি। বাংলার সংগীতসাহিত্য এবং সংগীতকলার নবরূপায়ণ বঙ্কিমের অভ্যুদয়ের অনেক পূর্বেই ঘটেছে। রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কাব্যসংগীতকে সংগঠিত করেছেন, তাঁর সমসাময়িক কালী মীর্জা গান লিখেছেন—গেয়েছেন, রাধামোহন সেন সংগীতের ইতিবৃত্ত প্রণয়ন করেছেন। এঁদের কিছুকাল পরেই কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব তাঁর প্রকাণ্ড 'সংগীতরাগ-কল্পদ্রুম' গ্রন্থে বাংলার বহু গান বিধৃত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যখন জন্মগ্রহণ করেছেন তখন বাংলার সংগীতসাহিত্যের একটি যুগ অতিক্রান্ত হতে চলেছে। বঙ্কিমের পূর্ববর্তী এই-সব গীতিকার, লেখক এবং সংগ্রাহক সুশিক্ষিত ছিলেন। এ যুগের গান সংগীত এবং সাহিত্যের দিক থেকে যথেষ্ট উচ্চস্তরের ছিল কিন্তু দুরদৃষ্টবশত যে শ্রোতা এবং সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা তাঁরা লাভ করেছিলেন তা অনুরূপ স্তরের ছিল না। এঁরা যখন সংগীত রচনা করেছিলেন তখন শ্রোতৃ-সাধারণ সংগীতকে আমোদের অঙ্গ হিসাবে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন। ধনীরা তো বিশেষভাবে সংগীতকে বিলাসের উপকরণ হিসাবেই দেখতেন। অতএব স্রষ্টার যে গৌরব তাঁদের পাওয়া উচিত ছিল তা তাঁরা পান নি। এত বড়ো কৃতিত্বের স্বীকৃতি সে যুগে অল্পই প্রদান করা হয়েছে। এক ঈশ্বর গুপ্ত ছাড়া কেউই এই বিরাট প্রচেষ্টার মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হন নি। আরো দুঃখের বিষয় এই যে, ঈশ্বর গুপ্ত বাংলার কাব্যসংগীত সম্বন্ধে যে চিন্তার পরিচয় দিয়েছিলেন সেই চিন্তার ধারাটি পরবর্তীকালের ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবাহিত হয় নি। ফলে একটি যুগের মহৎ প্রচেষ্টা পরবর্তী যুগের উন্নততর সমাজে উত্তীর্ণ হয় নি; হলে সংগীতসাহিত্যের এতটা দুঃখকর অধঃপতন ঘটত না।

প্রাচীন গীতিকারদের একটা ভ্রম হয়েছিল। টপ্পা চালের প্রেমসংগীতের প্রশ্রয় তাঁরা অতিরিক্ত পরিমাণে দিয়েছিলেন। এই-সব গানের সঙ্গে মিশল খেউড় পাঁচালির গান এবং ক্রমে এদের প্রসার প্রতিপত্তি ঘটল ইতর সম্প্রদায়ের মধ্যে। বলা বাহুল্য, কলেজী

শিক্ষায় যাঁরা কৃতবিদ্য ছিলেন তাঁদের রুচি এবং সমাজ ছিল আলাদা। তাঁরা এই-সব গানকে ঘৃণ্য দৃষ্টিতে দেখতেন। যাঁরা এই মার্জিত সমাজের লোক ছিলেন তাঁরা যদি পূর্ববর্তী ও সমকালীন সংগীতের যথার্থ মূল্যায়নে অসমর্থ হয়ে থাকেন তা হলে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না।

সংগীতজগতেও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে নি যার জন্য সংগীত একটা আবর্তের মধ্যে পড়ে ক্রমে পঙ্কিল হয়ে পড়েছিল। একদা নিধুবাবুর মনে এই চিন্তার উদয় হয়েছিল যে, তিনি পশ্চিমী টপ্পার আদর্শে বাংলায় গান রচনা করবেন। কালক্রমে দেখা গেল তিনি যে শুধু সফল হয়েছেন তাই নয়, বাংলার গীতকলায় একটি বিশেষ শ্রেণীর সৃষ্টি করতেও সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু যখন এই উৎকৃষ্ট সংগীতকলা নিম্নগামী হতে শুরু করেছে তখন যদি কোনো প্রতিভাসম্পন্ন গীতিকার চিন্তা করতেন, কী করে বাংলা গানের মোড় ফেরানো যায় তা হলে আর-একটি সার্থক শ্রেণীর উদ্ভাবন হতে পারত, কিন্তু সেটি আর সেভাবে হল না এবং টপ্পা লঘুসংগীতেই মিশে গেল।

আরো একটি কারণে বাংলা গানের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়েছিল সেটি হচ্ছে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, পশ্চিম-ভারতীয় সংগীত তথা হিন্দী গানের প্রসার। নবাব ওয়াজিদ আলী শা মেটিয়াবুরুজে বন্দী ছিলেন ১৮৫৮ সাল থেকে ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ঊনত্রিশ বছর। সংগীতজগতে তিনি ছিলেন পরম উৎসাহদাতা। বড়ো বড়ো ওস্তাদ তাঁকে গান শোনাতে আসতেন এবং তাঁর স্বীকৃতি পেলে ধন্য হতেন। ফলে বাংলার গায়কসমাজ হিন্দী গানে বিশেষ উৎসাহী হয়ে উঠলেন এবং বাংলার চিরায়ত সংগীত অবহেলিত হতে লাগল। আগেও রাজা-মহারাজদের সভায় পশ্চিমী ওস্তাদ থাকতেন। রাজা রাজবল্লভের সভায় ছিলেন আবুবরস খাঁ, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় ছিলেন বিশ্রাম খাঁ। এঁরা হিন্দী গান শোনাতেন। অপর পক্ষে বাঙালি গীতশিল্পী বাংলা গান রচনা করতেন। এতে বাংলার সংগীতচিন্তা অনেক পরিমাণে বজায় থাকত, কিন্তু সহসা হিন্দী গানের প্রতি প্রবল আসক্তির ফলে বাংলার সংগীতচিন্তা ব্যাহত হল। বাঙালি গায়কেরা যদি এই সময়ে হিন্দী গানের গুণগুলি আত্মসাৎ করে বাংলা গানে সেগুলি সন্নিবিষ্ট করতে চেষ্টা করতেন তা হলে একটি নতুন গীতকলা দেখা দিত। কিন্তু সেটা না হয়ে বাংলা গানের প্রতি ঔদাসীন্যই পরিলক্ষিত হল। এই সময়েই বিশেষভাবে বাংলার গাইয়েরা বিবিধ ঘরানায় যুক্ত হবার আগ্রহ দেখান, কেননা ওস্তাদ হবার বাসনা তাঁদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল। একমাত্র বিষ্ণুপুর এই সময়ে স্বীয় কৌলীন্য রক্ষা করে এসেছিল। রামশঙ্কর এবং তদীয় শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই বিষ্ণুপুরের ধারাকে সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। বিশেষ করে অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বিষ্ণুপুরী রীতির একজন প্রধান রক্ষক ছিলেন।

এই আগ্রহের একটা কারণও ছিল। পূর্বেই বলেছি, এই সময়ে বাংলার সংগীতে উৎসাহিত হবার মতো বিশেষ কিছু ছিল না। প্রাচীন গীতিকারেরা তিরোহিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের স্থলে যে-সব অনুকরণকারী দেখা দিয়েছিল তারা সংগীতকে এমন স্তরে নামিয়ে এনেছিল যা কেবল বাবু এবং ধনী সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জনের জন্যই নিয়োজিত হত। কবি এবং পাঁচালির ইতর অংশগুলিই প্রধান হয়ে উঠেছিল এবং সেগুলি থেকে শ্রোতারা বিলক্ষণ আনন্দ লাভ করত। বাংলা গানের এই যৎকিঞ্চিৎ মূল্য উচ্চ শ্রেণীর গায়কদের যদি পরিতৃপ্ত করতে না পারে তবে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। এই পরিস্থিতিকে অনেক পরিমাণে সুস্থ ও স্বাভাবিক করবার চেষ্টা দেখা দিল ব্রহ্মসংগীতের মাধ্যমে।

বাংলা গান যে এই নতুন পথটি খুঁজে পেয়েছিল সে গীতিকারদের সংগীতচিন্তার মধ্য দিয়ে নয়, তার মূল কারণ সামাজিক আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায়। ব্রহ্মোপাসনায় তিনি সংগীতের আবশ্যকতা উপলব্ধি করেছিলেন। উপনিষদ পাঠের সঙ্গে যে সংগীত হত তা সব সময় তাঁর মনঃপূত হত না। বহু গুণী ব্যক্তির গান তিনি শুনেছিলেন, কিন্তু এমন সংগীতের সন্ধান তিনি পান নি যা উপনিষদের মতো গভীর, জ্ঞানময় এবং উদাত্ত। অবশেষে তিনি নিজেই সংগীতরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তিনি নিজে সংগীতজ্ঞ ছিলেন। কথিত আছে, তিনি মাঝে মাঝে সংগীত শিক্ষার জন্য কালী মীর্জার সঙ্গে যোগস্থাপন করতেন। ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ নিধুবাবুকে ব্রহ্মসংগীত রচনার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং তিনি একটি ব্রহ্মসংগীত রচনাও করেছিলেন, কিন্তু রামমোহনের সঙ্গে তাঁর সংযোগ স্থাপিত হয় নি।

রামমোহন যে সংগীত রচনা করেছিলেন সাহিত্যের দিক থেকে তার সার্থকতা বেশি নয়, কিন্তু সমাজে তিনি একটি বিশেষ সংগীতচিন্তা আনতে পেরেছিলেন, এইটিই তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব। ব্রহ্মসংগীতের প্রতি বাংলার জনসাধারণ আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তার কারণ এই যে, তাঁরা সংগীতে এমন একটা বস্তুর সন্ধান পেলেন যা তাঁদের চিত্তকে মহান ভাবে উদ্বুদ্ধ করল। বাংলা গানে এতকাল ঋজুতার যে বিশেষ অভাব ছিল, সেটি ব্রহ্মসংগীতের প্রভাবে অনেক পরিমাণে দূর হল। রামমোহন ধ্রুপদের মধ্য দিয়ে এই চিন্তার উদ্রেক করেন নি। ধ্রুপদ ভেঙে ব্রহ্মসংগীত আরো কিছুকাল পরে সংগঠিত হয়। তিনি প্রচলিত রীতিকেই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর অধিকাংশ গীত আড়াঠেকায় রচিত। আড়াঠেকায় তান বিস্তারের সুযোগ আছে এবং এটি তেতালারই একটি রকমফের। তখনকার দিনে টপ্পার চালে অনেক গানই আড়াঠেকায় গীত হত। রামমোহন একই

ধারায় সংগীতে একটি ভিন্ন রসের প্রবর্তন করলেন। তাঁর সঙ্গে একই ধরনে আরো কয়েকজন গান রচনা করেছিলেন। এঁদের রচনাও ধ্রুপদকে অনুসরণ করে নি। রামমোহনের ধর্মসংগীত প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একটি বর্ণনা দিয়েছেন, সেটি থেকে রামমোহনের প্রচেষ্টা সম্পর্কে উত্তম ধারণা করা যায় :

'একদিন রামমোহন রায় বলিলেন যে ভাল ভাল গায়ক সকল সংগ্রহ করিয়া মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মসমাজে সংগীত দিলে ভাল হয়, অমনি গুণী গায়ক সকল সেখানে একত্রিত হইল এবং নানা ভাবের সংগীত চলিল। রামমোহন রায় বলিলেন, "ও-সব কেন? অলখনিরঞ্জন গাও"। তখন ব্রহ্মসংগীত হইতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গীদিগের মধ্যে একটুকুও তখন কাহারও বুঝা হয় নাই যে, ব্রাহ্মসমাজে সংগীত গাইতে বলিলে ঈশ্বরের সংগীত গাইতে হইবে। ...তিনি গম্ভীরভাবে সমাজে আসিয়া উপাসনা করিয়া যাইতেন, কোন সহযোগী থাকুক আর নাই থাকুক। যেমন গঙ্গা বা জগন্নাথের যাত্রী দূর হইতে পদব্রজে আইসেন, তেমনি তাঁহাদের শিষ্যদের সহিত একত্র হইয়া মানিকতলা হইতে পদব্রজে এই সমাজে আসিতেন। যাইবার সময় গাড়ি করিয়া যাইতেন। এই একটি তাঁহার অতীব শ্রদ্ধার ভাব ছিল। তখন ইংরাজরাও তাহাতে যোগ দিতেন। তখনকার লোকদিগের মধ্যে সমাজের সহিত এখন আর কাহারও যোগ দেখা যায় না; কেবল তখনও যে বিষ্ণু গান করিত, এখনও সেই বিষ্ণু আছে।'

ব্রহ্মসংগীতের আদিযুগে বিষ্ণু চক্রবর্তীর প্রভাব ছিল খুব বেশি। তিনি বাংলা ব্রহ্মসংগীত গাইলেও প্রধানত ছিলেন ধ্রুপদগায়ক। খেয়ালও তিনি গাইতেন, কিন্তু সে ধ্রুপদের অনুগামী খেয়াল। তিনি তান অল্পই দিতেন এবং রাগের বিস্তারের প্রতি অধিকতর লক্ষ রাখতেন। দীর্ঘকাল ধরে বিষ্ণু ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং এঁর শেখানো হিন্দী গান ভেঙে বহু ব্রহ্মসংগীত রচিত হয়েছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সংগীতে রামমোহনের আদর্শই রক্ষা করেছেন। তাঁর অধিকাংশ গান আড়া, যৎ এবং একতালায় বাঁধা। অবশ্য তাঁর বিখ্যাত গান 'যোগী জাগে ভোগী রোগী কোথায়' চৌতালে নিবদ্ধ। দেবেন্দ্রনাথ যদিচ বাংলার চলমান ধারাকেই গ্রহণ করেছেন তথাপিত তিনি ধ্রুপদের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং ধ্রুপদের গাম্ভীর্য সংগীতে প্রতিফলিত হলে তিনি আনন্দিত হতেন। দেবেন্দ্রনাথ পর্যন্ত দেখা যায় ব্রহ্মসংগীতে বাংলার ঐতিহ্যই বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছে। খাঁটি বাংলা পদ্ধতির সঙ্গে বিশুদ্ধ মার্গসংগীত গীত হয়েছে। এঁরা ধ্রুপদের অনুরাগী হয়েও সহসা যে হিন্দী গান থেকে বাংলা গানের রূপান্তর সৃষ্টি করেন নি এটি একটি অসাধারণ সংগীতচিন্তার ফল। এতদিন ধরে ধ্রুপদ কীভাবে বাংলা গানে প্রযুক্ত হতে পারে এবং একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর

সৃষ্টি করতে পারে তারই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। অর্থাৎ, বাংলা গানে উপযুক্ত গাম্ভীর্য এবং সম্ভ্রমপূর্ণ গতির প্রতিষ্ঠা হলে তবেই ধ্রুপদাঙ্গ গান রচিত হওয়া সম্ভব ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যখন ব্রহ্মসংগীত রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন তখন এই পরিবেশটি রচিত হয়েছে এবং একে পরবর্তীকালে পূর্ণতা প্রদান করলেন রবীন্দ্রনাথ। ধ্রুপদের সঙ্গে ধামারও পরবর্তীকালে ব্রহ্মসংগীতে প্রবেশ করেছে। অবশ্য রামমোহনের 'ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়' ধামারে গাওয়া হত বলে উল্লিখিত আছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তার মধ্যে অসাধারণত্ব ছিল। তাঁদের বাড়িতেই তিনজন বড়ো বড়ো গায়ককে পাওয়া যেত; তাঁরা হচ্ছেন—রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিপুরের জমিদার রাজচন্দ্র রায় এবং যদুভট্ট। যদুভট্ট উত্তম পাখোয়াজীও ছিলেন। এঁদের গান ভেঙে দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উভয়েই সংগীত রচনা করেছেন। যে-কোনো গায়কের গান ভালো লাগলেই তাঁরা সেটা টুকে নিয়ে ব্রহ্মসংগীত রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথ নাকি বিষ্ণু চক্রবর্তীর হিন্দী গান ভেঙে সর্বপ্রথম ব্রহ্মসংগীত রচনা করেন। এইভাবে ব্রহ্মসংগীত হিন্দীসংগীতের সহায়তায় উচ্চাঙ্গসংগীতে স্থান লাভ করেছে।

শোনা যায় ব্রহ্মসংগীতের জন্য দ্বিজেন্দ্রনাথই প্রথম স্বরলিপি বের করবার চেষ্টা করেন। তিনি নিজে তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছিলেন যে, বাংলায় প্রথম স্বরলিপি যে তাঁর সৃষ্টি এ বিষয়ে তিনি একেবারে নিঃসন্দেহ। শৌরীন্দ্রমোহন নাকি তাঁর প্রচেষ্টা জানবার পর তাড়াতাড়ি একটি স্বরলিপি প্রস্তুত করে ছাপিয়ে দেন। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—'জ্যাঠামহাশয়ও তাঁর ওই প্রকাণ্ড মস্তিষ্ক থেকে এক স্বর-সুদর্শনচক্র বের করে ছাপালেন। সা রে গা মা সব তার ভিতর ধরা আছে। যে কোনো সুর ধরা পড়ে তাতে। জানি নে কোথায় আছে তা এখন', (গীতবিতান বার্ষিকী)। ১৮৬৯ সালের অক্টোবর মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শেষে 'সংগীত লিপিবদ্ধ করিবার চিহ্নাবলী' এবং পাঁচটি ব্রহ্মসংগীতের স্বরলিপি মুদ্রিত হয়েছিল। এটি নাকি দ্বিজেন্দ্রনাথই করে দিয়েছিলেন।

ব্রহ্মসংগীতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একই ধারা অনুসরণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর স্বাধীন চিন্তা ছিল সুদূরপ্রসারী। বস্তুত ঊনবিংশ শতাব্দীর সংগীতচেতনার মূলে তিনিই ছিলেন। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় 'গীতসূত্রসার' রচনা করে স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মনে যেন একটি রেষারেষির ভাগ ছিল। যদিচ ঠাকুর-পরিবার তাঁর সর্বপ্রথম গুণগ্রাহী তথাপি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যখন আকারমাত্রিক স্বরলিপির প্রবর্তন

সেকালে ভদ্র হিন্দুসমাজে সংগীতকে সুনজরে দেখা হত না; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াতের ফলে বহু শিক্ষিত ব্যক্তি হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, উপযুক্ত পরিবেশে উত্তম কাব্যসংগীত অত্যন্ত উপভোগ্য বস্তু। ব্রাহ্মসমাজ সংগীতকে উচ্চ স্থান প্রদান করবার ফলে বৃহত্তর হিন্দুসমাজও ধীরে ধীরে সংগীতের প্রতি তাঁদের বিদ্বেষকে পরিহার করতে লাগলেন। উচ্চাঙ্গসংগীতের সংগঠনবৈশিষ্ট্য এবং কাব্যসংগীতের মনোহারিত্ব এই উভয়ের সমন্বয়ে যে সংগীত প্রস্তুত হল, তাকেই শিক্ষিত জনসাধারণ বিশেষভাবে গ্রহণ করলেন। পরবর্তীকালে এই দিকে দৃষ্টি রেখে কাব্যসংগীত রচিত হতে লাগল। ব্রহ্মসংগীতের ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন রামমোহন। তার পরে এলেন পুত্রপরিজনসহ দেবেন্দ্রনাথ। ব্রহ্মসংগীত এঁদের প্রচেষ্টায় আর্টসংগীতে পরিণত হল। এইসঙ্গে অপরাপর যাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য, তাঁরা হলেন কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কুঞ্জবিহারী দেব, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। এ বিষয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী, কালীনারায়ণ গুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ মহানুভব ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টাও বড়ো কম নয়। এতদ্ব্যতীত তখনকার দিনে যে-সব জনপ্রিয় গীতিকারের গান প্রচলিত ছিল সেগুলিও শ্রদ্ধাসহকারে গৃহীত হয়েছিল। এই-সব গীতিকারের মধ্যে দাশরথি রায় এবং নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন।

ক্রমে ক্রমে পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক সংগীতের একটি মূল্যায়ন-প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হল, যার ফলে অনেকে বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রবুদ্ধভাবে ভালো ভালো উপকরণ সংগ্রহ করতে লাগলেন। এই প্রচেষ্টাতেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অবদান এবং প্রভাব অল্প ছিল না। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কবি অক্ষয় চৌধুরীর বিশেষ সহায়তা ছিল। এ ছাড়া ছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং স্বর্ণকুমারী দেবী। বাংলার কাব্যসংগীতে গীতিকার হিসাবে অক্ষয় চৌধুরীর দান বড়ো কম নয় অথচ এখন তাঁর গানগুলি একেবারেই শোনা যায় না। বিশেষ পরীক্ষামূলক কাজে তিনি খুব সহজভাবে যেসব গান রচনা করেছেন, একসময় তা বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। তাঁর একটি গান 'নিতান্ত না রইতে পেরে দেখিতে এলেম আপনি' নানা ঢঙে গীত হত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিয়ানো বাজিয়ে নানা রকম সুরের ছক তৈরি করতেন এবং এঁদের অনেক গান সেই ছকে গঠিত হয়েছে। বর্তমানে পিয়ানো এবং গীটারে এই-সব গান মাঝে মাঝে বাজালে সেই দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে এবং একটি ক্লাসিকাল প্রচেষ্টাও সঞ্জীবিত থাকে। উৎসাহী ব্যক্তিগণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রচিত 'স্বরলিপি গীতিমালা' থেকে এই গানগুলি সংগ্রহ করতে পারেন।

সেকালে ভদ্র হিন্দুসমাজে সংগীতকে সুনজরে দেখা হত না; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াতের ফলে বহু শিক্ষিত ব্যক্তি হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, উপযুক্ত পরিবেশে উত্তম কাব্যসংগীত অত্যন্ত উপভোগ্য বস্তু। ব্রাহ্মসমাজ সংগীতকে উচ্চ স্থান প্রদান করবার ফলে বৃহত্তর হিন্দুসমাজও ধীরে ধীরে সংগীতের প্রতি তাঁদের বিদ্বেষকে পরিহার করতে লাগলেন। উচ্চাঙ্গসংগীতের সংগঠনবৈশিষ্ট্য এবং কাব্যসংগীতের মনোহারিত্ব এই উভয়ের সমন্বয়ে যে সংগীত প্রস্তুত হল, তাকেই শিক্ষিত জনসাধারণ বিশেষভাবে গ্রহণ করলেন। পরবর্তীকালে এই দিকে দৃষ্টি রেখে কাব্যসংগীত রচিত হতে লাগল। ব্রহ্মসংগীতের ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন রামমোহন। তার পরে এলেন পুত্রপরিজনসহ দেবেন্দ্রনাথ। ব্রহ্মসংগীত এঁদের প্রচেষ্টায় আর্টসংগীতে পরিণত হল। এইসঙ্গে অপরাপর যাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য, তাঁরা হলেন কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কুঞ্জবিহারী দেব, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। এ বিষয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী, কালীনারায়ণ গুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ মহানুভব ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টাও বড়ো কম নয়। এতদ্ব্যতীত তখনকার দিনে যে-সব জনপ্রিয় গীতিকারের গান প্রচলিত ছিল সেগুলিও শ্রদ্ধাসহকারে গৃহীত হয়েছিল। এই-সব গীতিকারের মধ্যে দাশরথি রায় এবং নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন।

ক্রমে ক্রমে পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক সংগীতের একটি মূল্যায়ন-প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হল, যার ফলে অনেকে বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রবুদ্ধভাবে ভালো ভালো উপকরণ সংগ্রহ করতে লাগলেন। এই প্রচেষ্টাতেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অবদান এবং প্রভাব অল্প ছিল না। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কবি অক্ষয় চৌধুরীর বিশেষ সহায়তা ছিল। এ ছাড়া ছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং স্বর্ণকুমারী দেবী। বাংলার কাব্যসংগীতে গীতিকার হিসাবে অক্ষয় চৌধুরীর দান বড়ো কম নয় অথচ এখন তাঁর গানগুলি একেবারেই শোনা যায় না। বিশেষ পরীক্ষামূলক কাজে তিনি খুব সহজভাবে যেসব গান রচনা করেছেন, একসময় তা বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। তাঁর একটি গান 'নিতান্ত না রইতে পেরে দেখিতে এলেম আপনি' নানা ঢঙে গীত হত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিয়ানো বাজিয়ে নানা রকম সুরের ছক তৈরি করতেন এবং এঁদের অনেক গান সেই ছকে গঠিত হয়েছে। বর্তমানে পিয়ানো এবং গীটারে এই-সব গান মাঝে মাঝে বাজালে সেই দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে এবং একটি ক্লাসিকাল প্রচেষ্টাও সঞ্জীবিত থাকে। উৎসাহী ব্যক্তিগণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রচিত 'স্বরলিপি গীতিমালা' থেকে এই গানগুলি সংগ্রহ করতে পারেন।

কাব্যসংগীতের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশসংগীত রচনার পরিকল্পনাও এই যুগেই গ্রহণ করা হয়েছে। ব্রাহ্মসমাজের ধর্মীয় আন্দোলন থেকে যেমন প্রথমে ব্রহ্মসংগীত এবং পরে বৃহত্তর কাব্যসংগীত সংগঠিত হয়েছে, তেমনি হিন্দুমেলা থেকে স্বদেশসংগীত রচনার সুমহৎ প্রেরণা পাওয়া গেল। শুধু তাই নয়, দেশের বাদ্যযন্ত্র এবং দেশীয় বিবিধ সংগীতের সংরক্ষণ সম্বন্ধে উক্ত মেলায় প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয়েছিল। এই প্রস্তাব বিশেষ করে পেশ করেছিলেন মনোমোহন বসু। হিন্দুমেলা সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী তদীয় 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে একটি সুস্পষ্ট বর্ণনা প্রদান করেছেন :

'১৭৮৮ শকের (১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের) চৈত্রসংক্রান্তিতে হিন্দুমেলার অধিবেশন হইল। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্পাদক ও নবগোপাল মিত্র মহাশয় সহকারী সম্পাদক হইলেন। মেলার অধ্যক্ষগণ স্বদেশীয় উন্নতি, স্বদেশীয় সাহিত্যের বিকাশ, স্বদেশীয় সঙ্গীতাদির চর্চা, স্বদেশীয় কুস্তি প্রভৃতির পুনর্বিকাশে উৎসাহ দান করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। বর্ষে বর্ষে চৈত্রসংক্রান্তিতে একটি মেলা খোলা স্থির হইল। দেশের অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তি এইজন্য অর্থসাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। উৎসাহ-দাতাদিগের মধ্যে রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, বাবু রমানাথ ঠাকুর, বাবু কাশীশ্বর মিত্র, বাবু দুর্গাচরণ লাহা, বাবু প্যারীচরণ সরকার, বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বাবু কৃষ্ণদাস পাল, বাবু রাজনারায়ণ বসু, বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, পণ্ডিত ভারতচন্দ্র শিরোমণি, পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রভৃতির নামের উল্লেখ দেখা যায়। অতএব উদ্যোগকর্তৃগণ সকল বিভাগের মানুষকে সম্মিলিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। ১৮৬৮ সালে বেলগাছিয়ার সাতপুকুরের বাগানে মহাসমারোহে মেলার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। সেইদিন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ জাতীয়সঙ্গীত "গাও ভারতের জয়" সুগায়কদ্বারা গীত হয়; আমরা কয়েকজন জাতীয় ভাবের উদ্দীপক কবিতা পাঠ করি; গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নবগোপাল মিত্র মহাশয় মেলার উদ্দেশ্য সকলকে বুঝাইয়া দেন; এবং স্বজাতিপ্রেমিক সাহিত্যজগতে সুপরিচিত মনোমোহন বসু মহাশয় একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা পাঠ করেন। মেলার প্রথম সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মেলার উদ্দেশ্য এইভাবে বর্ণনা করেন—"ভারতবর্ষের এই একটি প্রধান অভাব যে আমাদের সকল কার্যেই আমরা রাজপুরুষগণের সাহায্য যাচ্ঞা করি, ইহা কি সাধারণ লজ্জার বিষয়! কেন, আমরা কি মনুষ্য নহি? ...অতএব যাহাতে এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়, ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।" সংক্ষেপে বলিতে গেলে জাতীয় স্বাবলম্বন প্রবৃত্তিকে জাতীয় চিত্তে উদ্দীপ্ত করাই হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য ছিল। সুখের বিষয়, এই মেলার আয়োজনের দ্বারা সে

উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণে সাধিত হইয়াছে। ইহার পরে মনোমোহন বসু প্রভৃতি জাতীয়সঙ্গীত রচনা করিতে লাগিলেন; আমরা জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা রচনা করিতে লাগিলাম; বিক্রমপুর হইতে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় আসিয়া আমাদের জাতীয়ভাবে যোগ দিলেন; এবং আগ্রার আনন্দচন্দ্র রায় সঙ্গীত রচনা করিয়া দুঃখ করিলেন—

কতকাল পরে বল ভারত রে
দুখসাগর সাঁতারি পার হবে; ইত্যাদি।

দেখিতে দেখিতে স্বদেশপ্রেম সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ১৮৬৮ সালের পরে হিন্দুমেলার কাজ অনেক দিন চলিয়াছিল। নবগোপালবাবু ইহাকে জীবিত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ক্রমে তাহা উঠিয়া যায়।'

গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র গণেন্দ্রনাথ জাতীয়তার আদর্শ সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিলেন। তিনিই 'নবনাটক' লিখিয়ে অভিনয় করিয়েছিলেন এবং এই নাটকের পুরোভাগেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দেশী-বিদেশী বাদ্যযন্ত্র সহযোগে কনসার্ট যোজনা করেছিলেন। গণেন্দ্রনাথ একটি বিখ্যাত ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছিলেন, সেটি হচ্ছে 'গাও হে তাঁহারি নাম রচিত যাঁর বিশ্বধাম, দয়ার যাঁর নাহি বিরাম, ঝরে অবিরত ধারে।' হিন্দুমেলায় তিনি এই গানটি রচনা করে স্বদেশসংগীতের অন্যতম পথিকৃৎ হন :

বাহার যৎ

লজ্জায় ভারত-যশ গাহিব কি করে।
লুঠিতেছে পরে এই রত্নের আকরে।।
সাধিলে রত্ন পাই তাহাতে যতন নাই।
হারাই আমোদে মাতি অবহেলা করে।।
দেশান্তর জগজন ভুজে ভারতের ধন
এ দেশের ধন হায় বিদেশীর তরে।
আমরা সকলে হেথা হেলা করি নিজ মাতা
মায়ের কোলের ধন নিয়ে যায় পরে।।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গাও ভারতের জয়' অর্থাৎ 'মিলে সবে ভারত-সন্তান একতান মনপ্রাণ গাও ভারতের যশোগান' গানটিতে বিষ্ণু চক্রবর্তী খাম্বাজ সুর দিয়েছিলেন। হিন্দুমেলায় এটি এই সুরে আড়াঠেকায় গাওয়া হয়েছিল। বিলম্বিত লয়ে এই দীর্ঘ গানটি বোধ হয় যথেষ্ট উদ্দীপক হয় নি। পরে (সম্ভবত ১৮৭৩ সালে) গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে এই গানটিকে অন্য সুর দিয়ে ওজস্বী করে তোলা হয়েছিল। হিন্দুমেলার

অপর একটি জনপ্রিয় গান দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা—'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি'। এই গানটি নট-বেহাগ রাগে গাওয়া হয়েছিল। মনোমোহন বসু যাত্রা, থিয়েটার, পাঁচালি, হাফ আখড়াই, কবি, বাউল, সংগীর্তন সবই রচনা করেছেন। স্বদেশসংগীতের মধ্যে তার 'দীনের দিন হয়ে পরাধীন' (ভৈরবী-একতালা), 'নরবর-নাগেশ্বর শাসন কি ভয়ঙ্কর' (বিভাস-একতালা), বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। এ ছাড়া বাউলের সুরে 'কোথায় মা ভিকটোরিয়া দেখ আসিয়া ইণ্ডিয়া তোর চলছে কেমন' ছড়াটিও জনপ্রিয় ছিল। স্বদেশসংগীতের রচনা এই সময় থেকে অব্যাহত থাকে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' সংগীতের পর স্বদেশী গান ক্রমে কাব্যসংগীতের একটি বিশেষ শ্রেণী বলে গণ্য হয়ে এসেছে।

এই যুগে একদিকে যেমন প্রযুক্ত সংগীতের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে অপর দিকে তেমনি শিক্ষা ও বিদ্যা সংরক্ষণের জন্যও বিবিধ চেষ্টা হয়েছে। এ-বিষয়ে শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রচেষ্টা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে ইংরেজিতে যে-সব গ্রন্থ রচিত হয়েছিল সেগুলি তিনি একসঙ্গে ছাপিয়ে বের করেন ১৮৭৫ সালে Hindu Music from various authors এই নামে। এই সময় থেকে ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত তিনি আরো অনেকগুলি ইংরেজি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'সঙ্গীত সার সংগ্রহ' নামক গ্রন্থে তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রাদি উদ্ধার করে প্রকাশ করেন। এর মধ্যে 'সঙ্গীত রত্নাকর'-এর অনেকখানি অংশ সন্নিবেশিত হয়েছে। দুঃখের বিষয় এই-সব গ্রন্থে প্রচুর ভ্রম বর্তমান। তথাপি তখনকার দিনে অনেকে এই-সব গ্রন্থ থেকে প্রচুর উপকার পেয়েছিলেন। শৌরীন্দ্রমোহনের আর-একটি উল্লেখযোগ্য পুস্তক হচ্ছে 'যন্ত্রকোষ'। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে তিনি বাংলায় ব্যবহৃত সব রকম বাদ্যের বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর 'যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা'-য় সেকালের বহু প্রচলিত অপ্রচলিত রাগের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর গুরু ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সহযোগিতায় তিনি একটি সংগীত বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ক্ষেত্রমোহন 'সঙ্গীতসার' এবং 'কণ্ঠকৌমুদী' প্রণয়ন করেন। এ ছাড়া তিনি জয়দেবের গীতগোবিন্দের কয়েকটি গানের স্বরলিপিও প্রকাশ করেছিলেন। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬৭ সালে 'বঙ্গৈকতান' নামক গ্রন্থে ঐকতানবাদ্যের কতকগুলি গৎ প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আরো অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে সংগীত সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়েছে।

ঈশ্বর গুপ্ত বাংলার বিবিধ গীতিকার এবং গীতপ্রসঙ্গে 'সংবাদ প্রভাকর'-এ লেখবার পর থেকে এদিকে একটি ক্ষীণ প্রচেষ্টা থেকে গিয়েছিল। ক্রমে পত্র-পত্রিকায় সংগীতবিষয়ক প্রবন্ধাদির প্রকাশ একটি নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় এবং তত্ত্ববোধিনী,

বালক, ভারতী, সাধনা প্রভৃতিতে সংগীতবিষয়ক রচনার কথা আজ সুবিদিত। এই-সব কাগজে লেখক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ নিজেই অগ্রণী হয়েছিলেন।

বাংলায় সংগীতের যে অধ্যায়ের আলোচনা করা হল এটি প্রধানত রবীন্দ্র-অভ্যুদয়ের পূর্বেকার বৃত্তান্ত। কৈশোরের সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ একটি প্রস্তুত সংগীতজগৎ পেয়েছিলেন যাঁরা তাঁর রচনাকে সাদরে বরণ করে নিয়েছিলেন। এই প্রস্তুতিপর্বটি অল্প আয়াসে সাধিত হয় নি। এর পশ্চাতে যাঁরা ছিলেন তাঁরা বিপুল প্রতিভা এবং ক্ষমতা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তীরা সংগীতকে আমোদলিপ্সু অর্ধশিক্ষিত শ্রোতৃসমাজ থেকে উদ্ধার করে রুচিশীল, সংস্কৃতিসম্পন্ন সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কাব্যসংগীতকে তাঁরা সাহিত্যের পর্যায়ে স্থাপন করেছেন। সামাজিক অনুষ্ঠানে, সভা-সমিতিতে সংগীত একটি নিয়মিত অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করবার মূলে তাঁদের একাগ্র প্রচেষ্টা বর্তমান। এতদ্ব্যতীত নাটক, ঐকতান, স্বদেশসংগীত, সংগীতসাহিত্য—এই সবেরই একটি সুদৃঢ় ভিত্তি রবীন্দ্রনাথের কৈশোরকালের মধ্যেই স্থাপিত হয়েছে। সুতরাং রামমোহন থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয়কাল পর্যন্ত সময়টি বাংলার সাংগীতিক ইতিহাসে একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ যুগ। রবীন্দ্রনাথ এই আদর্শবাদী যুগেরই শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী।